দৈনিক জনকণ্ঠ
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06-MAR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ভর্তি সঙ্কট

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সঙ্কট আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রায় সমাধানহীন একটি বাড়তি সঙ্কট হয়েই রয়েছে। কিভাবে এবং কবে যে এর সমাধান হবে, সেকথা দেশের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে কারও জানা আছে বলেও মনে করার মতো কোন বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। অথচ আমাদের সমাজ জীবনের অন্য সকল সঙ্কটের মতোই এ সঙ্কটেরও জরুরী সমাধানই সাধারণ মানুষের কাম্য। এ সঙ্কট সারাবছর ধরেই চলছে। একেক সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের একেকটি অংশকে এর শিকার হতে হয়। এখন যেমন এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ভয়ানক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির সমস্যা। এরপর আসবে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অনুরূপ সমস্যা। আর, বছরের শুরুতে আছে একেবারে নিচু ক্লাশ থেকে আরম্ভ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের ভর্তির সমস্যা। এমনিতেই আমাদের দেশে দেশে একেবারে নিম্নস্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সঙ্কোচনের প্রক্রিয়াটাই অত্যন্ত প্রকট, পীড়াদায়ক ও জাতির জন্য একটি লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতার গত দু'যুগেও আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার তেমন কিছু বাড়েনি। এখনও নিরক্ষরই রয়ে গেছে দেশের শতকরা ৭২ ভাগ মানুষ। আর যে ২৮ শতাংশ মানুষ সাক্ষর হয়েছে বলে প্রচার করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে আছে কোনরকমে শুধু নিজের নামটুকু সাক্ষর করতে পারে জনসংখ্যার এমন কিছু অংশ, সেইসঙ্গে খবরের কাগজও পড়তে পারে জনসংখ্যার সেরকম কিছু অংশ এবং মোটামুটি লেখাপড়া জানা জনসংখ্যার কিছু অংশ। আর, উচ্চ শিক্ষিত মানুষের হার দেশে একেবারেই হাতেগোনা এবং নগণ্য; শতকরা হয়ত ৫ ভাগও হবেনা। এহেন অবস্থায় শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর তথা সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের অপরিহার্য পূর্বাবস্থা, অর্থাৎ ভর্তি হওয়ার অনুকূল অবস্থাটুকুই যদি না থাকে, তাহলে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির তেমন ভরসা করার কিছু থাকেনা। অর্থাৎ দেশে শিক্ষিতের ও সাক্ষর মানুষের হার বৃদ্ধি না-হওয়ার মূলে ভর্তি না হতে পারা ও চাহিদা অনুযায়ী আসন সংখ্যা না-থাকার অবস্থাটি এক্ষেত্রে বহুলাংশেই দায়ী। এছাড়া, সর্বস্তরেই 'ড্রপ আউট'-এর সমস্যা অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে না-পারার সমস্যা রয়েছে। বিরাজ করছে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা। শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির দরুন পরীক্ষায় পাসের হার হ্রাস পাওয়ার সমস্যাও রয়েছে। আর, রয়েছে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না-থাকার সমস্যাও। সরকারীভাবে যতই দেশের শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দের দাবি করা হোক, বাস্তবে সে-বর্ধিত ব্যয়বরাদ্দ দেশে শিক্ষা সঙ্কোচনরোধে কিংবা শিক্ষিত ও সাক্ষরের হারবৃদ্ধিতে তেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না। সেক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে রয়েছে দেশে বিরাজমান দুই শিক্ষানীতি বা ব্যবস্থা। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের সিংহভাগই ব্যয়িত হয় ক্যাডেট কলেজ, ও কিন্ডারগার্টেন বা অনুরূপ ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পিছনে। দেশের শিক্ষাখাতের সর্ববৃহৎ অংশ তথা বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে সরকারী বাজেটের সবচাইতে কম অংশে ব্যয়িত হয়। ফলে, দেশে নতুন বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার হারই যে শুধু কম তা-ই নয়, এ-ধরনের চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্রমশ অর্থসঙ্কটসহ নানান সঙ্কটের কবলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। আবার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও কখনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আসনসংখ্যা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। এর ফলেও, প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে শুরু করে একেবারে নিম্নস্তর পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বহুশিক্ষার্থী শুধু ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে লেখাপড়া বন্ধ করতে বা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। ভর্তিসমস্যা সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের একটি স্থায়ী 'টেনশনের উৎস হয়ে রয়েছে। গত বুধবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি খবরে এঅবস্থার এক 'টিপিক্যাল' চিত্র পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে; দেশের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ১৪৫০টি আসনে ভর্তির জন্য প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছে। তার আগের শিক্ষাবর্ষে আবেদন করেছিল ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী। আসন ছিল তখন ১৩২৫টি। তার মানে, সব সময়ই আসন সংখ্যার চাইতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৩/১৪ গুণ বেশি। দেশে জনসংখ্যার তুলনায় এখনও মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ও সেগুলোয় ভর্তির আসন সংখ্যা, দুই-ই অত্যন্ত অপ্রতুল। সাম্প্রতিককালে বেসরকারী উদ্যোগে দুয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলোতে ভর্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সামাজের অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি বিত্তবান শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই মাত্র তার সুফল ভোগ করতে পারছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা একান্তই অপ্রতুল। কার্যত আগে থেকে বিদ্যমান সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোয় আসনসংখ্যা না-বাড়ানোর দরুনই এমবিবিএস-এ ভর্তিচ্ছুদের সিংহভাগই আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। আবার সাম্প্রতিককালের এক তথ্য হচ্ছে, বুয়েটে একহর প্রতি আসনের জন্য প্রার্থী হচ্ছে ৮ জন। তার মানে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা এক্ষেত্রে আসন সংখ্যার আটগুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা কোর্সের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। অবশ্য, আমাদের দেশে নিম্ন পর্যায় থেকে ড্রপ আউটের হার এত বেশি যে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার দুয়ার পর্যন্ত আমাদের দেশের জনসংখ্যার অতিক্ষুদ্র একটি অংশই মাত্র পৌঁছতে পারে। সেদিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি হ্রাসের ওপর আমাদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। সাম্প্রতিককালের এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, চট্টগ্রাম মহানগরীর ৯টি সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর গত ২৩ বছরে আসনসংখ্যা, শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি। এ-অবস্থা বলতে গেলে সর্বব্যাপী এবং সারা দেশের একটি অভিন্ন অবস্থা।

আমরা চাইব, শিক্ষখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিটি যাতে অসার কোন দাবি মনে না-হয়, সেজন্য সর্বস্তরে সবধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকোর্সেই আসনসংখ্যা বাড়িয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ-সুবিধা চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধির বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। গোড়া কেটে গাছের আগায় পানি ঢালার মতো ব্যাপার কখনই কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনা।